প ত্ত ন

দেবাশিস চক্রবর্তী

ব ই ব ন্ধু

পত্তন বিষয়ে দু-কথা

যখন উত্তরবাংলার সমৃদ্ধিশালী শহর বলতে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট বা মালদহের নাম মুখে মুখে ঘুরত বাংলার মানুষের, সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার সিকিমের চোগিয়ালের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছিল পার্বত্য হিমালয়ের দার্জিলিং। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজরা চা-বাগিচার সূত্রপাত করে এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে। এবং সেই সঙ্গে দার্জিলিঙে গড়ে তোলে সেনা ও আমলাদের গ্রীষ্মকালীন শৈলাবাস। সংকীর্ণ একটি পথ কলকাতা থেকে দার্জিলিং পৌঁছে যেত সাহেবগঞ্জ থেকে, নাম হিলকার্ট রোড। গোরু বা মোষের গাড়িতে কষ্ট করে দার্জিলিং যাওয়া। রেল তখন ভারতে এলেও কলকাতা থেকে এখানে আসা যেত না লাইন না-থাকার দরুন। ইংরেজরা এতদঞ্চলের চা ও কাঠ রফতানি করবার সুবিধে এবং সরাসরি দার্জিলিঙে ট্রেনে পৌঁছে যাবার তাগিদে নতুন রেললাইন পাতার জন্যে জরিপ আরম্ভ করে জলপাইগুড়ি জেলার একটি ছোট্ট দু-আড়াইশো মানুষের গ্রাম শিলিগুড়িতে ১৮৭৫-এ। লাইন বসল। প্রথম ট্রেন এল শিলিগুড়ি স্টেশনে ১৮৭৮-এর জুলাই মাসে। সেই একটি ছোট্ট গ্রামে রেল স্টেশন হবার পর কেমন করে পালটে গেল, নগরায়ণের ইতিহাস কী করে শিলিগুড়ি মহকুমা শহর থেকে একটি বিশাল জনপদে রূপান্তরিত (কলকাতার পর পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী)

হল, সেই ইতিহাস নিয়েই বর্তমান উপন্যাসের কল্পনা। এখানে কিছু চরিত্র, ঘটনা, স্থান ও সময় প্রকৃত হলেও মূল কাহিনির সবটাই কাল্পনিক।

আর-একটা কথা জানানো দরকার। যে মানুষটির ইচ্ছে ও নির্দেশে এই উপন্যাস লেখা, সেই প্রবাদপ্রতিম কবি ও আজীবন উত্তরবাংলার মানুষ বেণু দত্তরায়, সাধ থাকলেও এটি ছাপা অক্ষরে দেখে যেতে পারলেন না। গত ৬ জুলাই তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় শুরু হোক এই উপন্যাস।

দেবাশিস চক্রবর্তী।
প্রতীচী। ডিরোজিও সরণি।
সুভাষপল্লী। শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১।

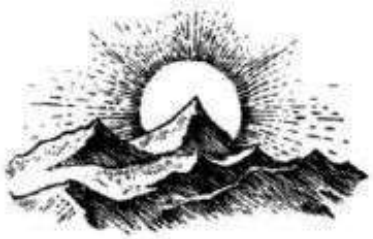

'দৈনিক বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটির ভেতরের পাতার মাঝের কলমের নীচের দিকের একটি সংবাদের ওপর নজর আটকে গেল গোলোকনাথের। পাবনা প্রসন্নকুমারী উচ্চ ইংরেজি স্কুলের ইতিহাস-ভূগোলের শিক্ষক গোলোকনাথ মৈত্র কমন রুমের অন্য শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, বুঝল্যান, এখুন সরাসরি রেলে চাপ্যে দার্জিলিং যাবোর পারবেন সব, লাটবাহাদুরের ন্যাজ ধরে।

সহশিক্ষকদের প্রায় সকলেই গোলোকনাথের দিকে চোখ রাখলেন। কেউ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, কেউ সরব প্রশ্নে। মানে?

কাগজে খবর দিচ্যে। বলেই গোলোকনাথ সংবাদপত্রটি নিজের চোখের সম্মুখে তুলে চাঁদির চশমাটিকে নাকের ওপর এগিয়ে পড়তে শুরু করলেন, কলিকাতা, তেসরা জুলাই, আঠারোশো একাশি। রয়টার সূত্রে অবগত হওয়া গেল যে, আগামীকল্য, অর্থাৎ চৌঠা জুলাই তারিখে টেরাইয়ের শিলিগুড়ি নামক স্টেশন হইতে দার্জিলিং পাহাড় অভিমুখে প্রথম রেলগাড়ি যাত্রা শুরু করিবে। প্রথম যাত্রী হিসাবে মহামান্য ভাইসরয় বাহাদুর সাহেব উক্ত ট্রেনে দার্জিলিং যাত্রা করিবেন। এটুকু পড়েই থামলেন। তারপর, মুখ তুলে সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, য্যাবেন নাকি কেউ? দার্জিলিং বেড়াতে?

সেটাই বাকি আছে। সামান্য মায়নার ইস্কুল মাস্টার য্যাবে দার্জিলিং বেড়াব্যার! আর কাঠে আগুন নাই, মাদারের কাঠে আগুন। মত্তির মশাই পারেনও বটে! মন্তব্য করলেন অঙ্কের শিক্ষক রজনিবাবু।

কেন, দার্জিলিং কি বিল্যাত, না আমেরিকা? ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায়। এই তো, আমার এক দাদা থাকেন জলপাইগুড়িত। মোক্তারি করেন। গোলোকনাথের

সমর্থনে বলেন প্রিয়কান্ত বসুরায়, ড্রিল মাস্টার।

জলপাইগুড়ি তো দূর হোল্যো। আমার নিজেরই পিসতাতো ভাই গোপেন সান্যাল, চাকরি করে টেরাইয়ের চা-বাগানে। সে যে কতবার কোচ্যে আমাকে তার বাগানে বেড়াব্যের যাওয়ার জন্যে, কী কব! বলেই গোলোকনাথ জানালেন, সমস্যাটা হল আসলে ওই টেরাইয়ের ক্লাইমেট। গোপেন কয়, ওদিক নাকি ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের ডিপো।

গোপেনের কওয়া লাগব্যে ক্যান, খবরের কাগজেই তো দেখি। আসলে ড্যাম্প ওয়েদার কিনা! প্রিয়কান্তর উক্তি। তা-ই বল্যে মানুষ যে সেখানে নাই, তা তো না।

মানুষ কোথায় নাই? গোলোকনাথ বলেন, একেবারে বরফাচ্ছাদিত মেরুপ্রদেশ থিক্যে ধু ধু মরুভূমি, আফ্রিকার ঘন জঙ্গল থিক্যে অতি উচ্চ তিব্বতের মালভূমি, সর্বত্তর মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে দিব্যি বাঁচ্যে আছে। আসলে কী জানেন, আমরা এইসব দুধে-ভাতে থাকা বঙ্গসন্তানই ঘরের বাহিরে যাব্যের চাই না। ঘরকুনা জ্যাত।

ও কথা কয়েন না মত্তির মশাই। বাঙালির কথা জানি না। তবে, এই পাবনা জেলারই মেলা মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়ে যে পাণ্ডববর্জিত দেশে পড়ে আছে, তার এগজাম্পল আমি দিবের পারি গাদাগুচ্ছের। রজনিবাবু তর্কে নামেন যেন।

সে কি আমি অস্বীকার করছি? আগেই তো গোপেনের কথা উল্লেখ করলাম। আরে, আমার নিজের ছাওয়াল জগবন্ধুই তো আছে সান্তাহার স্টেশনে। এন্ট্রান্স পাস দিয়েই চাকরি করব্যার চ্যালো, না করলাম না। আমার অবিশ্যি ইচ্ছা ছিল, এফএ-টা পাস করুক জগবন্ধু। কিন্তু, কলকাতায় পাঠানো আমার কম্ম না। টাকা পাব কোত্থিক্যে! তাই জোর কল্লাম না।

সান্তাহার আবার দূর কোথায়? পদ্মা পার হোল্যেই ত! স্তোক দিলেন প্রিয়কান্ত বসুরায়। তা, জগবন্ধু আছে কেমন? চিঠিপত্তর দেয় তো নিয়মিত?

মাসে এক-আধখান করে দেয়। উত্তর করেন গোলোকনাথ।

থাক্যে কোথায়?

রেলের কোয়ার্টারে।

একা?

দোকা পাবে কোথায়?

খাওয়াদাওয়া?

স্বপাক।

সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহন সিকদার, যিনি এতক্ষণ একটু তফাতে থেকে আলোচনা শুনছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন, মত্তির মশাই, এইবার ছাওয়ালটার একটা বিয়্যা দ্যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। নিজে হাত পোড়ায়ে কদ্দিন খাবে?

কেবল উনিশে পড়ছ্যে। এখুনি কী বিয়া দিব! চাকরিও তো বছর ঘোরে নাই। বলেন গোলোকনাথ।

আপনে কত বয়েসে বিয়্যা করছিলেন? পালটা প্রশ্ন মনোমোহনের।

ষোলো পার কোর‍্যে। সে তো জ্যাঠামশাইয়ের আদেশে। আমার ইচ্ছা ছিল না। তবু তো জোর কোর‍্যে ল্যাখাপড়া করে, এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়ছিলাম। ন্যালে, আমারও ওই যজমানি কর‍্যাই সংসার চালান লাগত।

সেসব ভোলেন। জগবন্ধু ইংরেজ সরকারের চাকরি করে। মায়নাকড়িও ভালো। এবার বিয়্যার ব্যবস্থা করেন। আমরা সব এই উপলক্ষ্যে একটু কবজি ডুবায়ে নেমন্তন্ন খাই। আর, যদি কন তো আমার নজরে ভালো পাত্রী আছে। তারাও ওই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আপনাগরে মতো।

মনোমোহন দাশগুপ্তর কথা শেষ না হতেই কমন রুমে হাসির রোল উঠল। রজনিবাবু বলে উঠলেন, বদ্যি হলে হবে কী! মনোমোহনবাবু বামুনদের খবরাখবরও কম রাখেন না।

রজনিবাবু নিজেও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ভাদুড়ি। তিনি বলেন, সে যদি মত্তির মশায়ের ইচ্ছা থাকে, ত্যালে বারেন্দির পাত্রী তো আমার হাতেই রোচ্যে। সুশ্রী, সুলক্ষণা, কাজেকম্মে পারদর্শী। বিয়্যাতে দিব্যে-থুবেও ভালো।

কার কথা কন? জানতে চান মনোমোহন।

আমার মেজোশ্যালি, মানে দিগম্বর চক্কত্তি আছে না? আমার ভায়রা।

আমি তো তার কথাই ভাবচিল্যাম। মনোমোহন বলেন। দিগম্বর আমাকে কয়দিন আগেই কোচিলো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়কান্তবাবুর উক্তি, তাল্যে আর শুভকাজে বিলম্ব ক্যান মত্তির মশাই? ভালো পাত্রী যখন হাতের কাছেই রোচ্যে তখন দিনক্ষণ দেখে না-হয়...

সে তো ধরেন, আমার শ্বশুরালয়ের খোঁজেও, নাটোরে, দু-একটা ভালো পাত্রীর কথা বলছিল আমার ছোটোশ্যালক তার দিদি মানে আমার পরিবারকে। আমি নিজেই গা করি নাই। দিনকাল পালটাচ্ছে। দেশে শিক্ষার মান বাড়তেছে। ছেলেরাও চায় যে, একটু স্বাবলম্বী হয়ে দার পরিগ্রহ করুক। সকাল সকাল বিয়া মানেই তো কাঁচা বয়েসে বাচ্চাকাচ্চা হওয়া, সংসারের বোঝা কাঁধে চাপা। কয়দিন আগেই একখান ইংরেজি ম্যাগাজিনে পড়তেছিলাম যে, অশিক্ষার কারণে, ভারতবর্ষ বা অনুন্নত দেশগুলাতে বাল্যবিবাহ প্রথা চালু আছে। এর কুফল হল বহু কিশোরী-মা এবং শিশুর অপমৃত্যু। সেই কারণেই আমি চাই, জগবন্ধুর একুশ না হলে বিয়া দিব না।

আরে, আঠারোতেই তো সাবালক হয় ছেলে! প্রিয়কান্ত মন্তব্য করেন।

তা হয়। তা-ই বলে আঠারো বছরের পাত্রের সঙ্গে তো আঠারো বছরের মেয়ের বিয়া দেওয়া যায় না! ছেলের সঙ্গে মেয়ের অন্ততপক্ষে পাঁচ-ছয় বছরের বয়েসের তফাত থাকা উচিত। বলেই গোলোকনাথ তাকালেন মনোমোহনের দিকে। মেয়ে তো নিশ্চয়ই ষোলো পার করে নাই?

বছর পনেরোর হবে।

মনোমোহনবাবুর উত্তরের পিঠেই রজনিবাবু বলে ওঠেন, কার কথা কন? দিগম্বরের মেয়ের? না, না, পনেরো হবে ক্যান, সে ষোলোয় পড়ছে গত অঘ্রানে। এটা হল যায়ে আষাঢ়। তার মানে, হিসেব করে তিনি বলেন, পনেরো বছর সাত মাস। দেখাশোনা করে দিনক্ষণ ঠিক করে, বিয়া দিতে দিতে ওই ষোলোই হবে।

বেশ কিছুক্ষণ এই সমস্ত আলোচনার পর টিফিন টাইম সমাপ্ত হল। ঘণ্টা বাজল। শিক্ষকেরা একে একে প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্লাসের পথে পা বাড়ালেন। গোলোকনাথ তাঁর ক্লাস সেভেনের কক্ষের পথে যেতে যেতে মনোমোহনকে বললেন, ভাবতেছি, আজ রাত্তিরে গিন্নির সঙ্গে একটু আলোচনাটা স্যারে নিব এ ব্যাপারে। কী কন?

তা তো নিতেই হবে। হাজার হোক, তিনি আপনেরো সহধর্মিণী, ইংরেজিতে যারে কয়, বেটার হাফ। তেনার কনসেন্ট না নিয়ে কোনো পারিবারিক শুভকাজ করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করি না।

মা-বাবা অকালে গত হলেও গোলোকনাথের বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই এবং জ্যাঠাইমা জীবিত আছেন। তাঁরা থাকেন খেতুপাড়া গ্রামে গোলোকনাথের পৈতৃক ভিটেয়। আছেন তাঁর এক পিসিমা। থাকেন বগুড়ার শেরপুরে। কাজেই, সকলের সম্মতি যে নিতেই হবে মূল সিদ্ধান্তে আসবার আগে, সে বিষয়ে গোলোকনাথ অবহিত। তবুও ইংরেজি প্রবাদ 'চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম'-কে মাথায় রেখে তিনি স্ত্রী-র কথাটি বলেছেন মনোমোহনবাবুকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তাঁর, মনোমোহন আবার অন্য কিছু ভাবলেন না তো? কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটা প্রিলিমিনারি টক বলতে পারেন। গুরুজনদের অনুমতি ছাড়া তো কিছু হবে না।

সে তো একশোবার। তবে কিনা ছাওয়াল তো আপনেরো। সেক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকাকে খাটো করে দেখলে চলবে ক্যান! যাই, ক্লাসে যাই। ছাত্তররা সব গোল শুরু করে দিছে। পরে কথা হবেনে।

গোলোকনাথ নিজেও ত্বরা বোধ করছেন। কাজেই বাক্যব্যয় না করেই শ্রেণিকক্ষের পথে পা বাড়ালেন।

সেদিন বিকেলে স্কুল ছুটির আগেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। আকাশ-ভাঙা সে বর্ষণের যেন ক্লান্তি নেই! শেষ পিরিয়ডের পর কমন রুমে এসে দেখেন, প্রায় সকলেই বাড়ি ফেরবার জন্যে পরনের ধুতিটি যথাসম্ভব শরীরের ঊর্ধ্বাংশে তুলে নিয়ে কোমরে গিঁট দিয়েছেন। জুতোজোড়া হাতে। প্রধান শিক্ষকমশাই নিজেও বারান্দার ওপর সহশিক্ষকদের সম্মুখে। কাউকে উদ্দেশ না করেই যে উক্তিটি তিনি করলেন তা হল, এ যে দেখছি, থামবার নামই করছে না। তারপর শিক্ষকদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, সবাই ঘরে ফিরবেন কী করে? কাকভেজা হয়ে যাবেন ত! কলকাতা শহরের মানুষটির কথায় দক্ষিণদেশি টান।

স্বর্ণকমলবাবু সহপ্রধান শিক্ষক। উত্তরটা তিনিই করলেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ

ঢাকার ডায়ালেক্ট-এ, না যাইয়াও তো কুনো উপায় দেহি না। এই বৃষ্টি আইজ থামব বইলা মনে অয় না। গোলকবাবু কী কন? আপনে তো জিউগ্রাফির টিচার!

একটু ফাঁপরে পড়লেন যেন গোলোকনাথ। ভূগোলের শিক্ষক হলেও তিনি আবহাওয়া সম্পর্কে যে তেমন অবহিত নন, সে কথা তো অতি সত্য। কাজেই তাঁর সহজ উত্তর হল, আজ্ঞে, এ বিষয়ে আর সকলের মতোই আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তবে যা অনুমান করতে পারি, তাতে এই বৃষ্টি খুব সহজে থামবে বলে মনে হয় না। আকাশ বেশ ভারী। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন।

কিঞ্চিৎ মৃদু হাসির চাপাস্বর শোনা গেল সহশিক্ষকদের মধ্যে থেকে। মনোমোহনবাবু বললেন, কথাটা বিশেষ ভুল বলেন নাই মত্তির মশাই। আমরা গ্রামদেশের মানুষ ত! আকাশের দিকে তাকায়ে আবহাওয়া আন্দাজ করার অভ্যাস। কাজেই বিলম্ব করে অযথা কালক্ষেপের কোনো কারণ দেখি না। কী কন প্রিয়কান্তবাবু?

প্রিয়কান্তবাবু বলেন, বলি আর কী? আপনে হলেন যারে ইসে, মানে ফিজিক্যাল ইনেসট্রাকটার। গায়েগতরে বলিষ্ঠ পুরুষ। আমি হল্যাম দুর্বল প্রকৃতির। তার ওপর শ্লেষ্মার রুগি। বৃষ্টিতে ভিজলেই নির্ঘাত নিমোনিয়া। কাজেই...

প্রিয়কান্তবাবুর কথা শেষ হতে-না হতেই মনোমোহনবাবু এবং আরও দুজন শিক্ষক জুতো বাঁ হাতে নিয়ে, পরনের ধুতি যথাসম্ভব ওপরের দিকে তুলে, ছাতা খুলে পা বাড়ালেন। ছাত্রদের প্রায় সকলেই স্কুল প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেছে অনেকক্ষণ আগেই। দু-একটি অল্প বয়সের ছেলে কোণের চতুর্থ শ্রেণির কক্ষের সামনে বারান্দার বসে মাঠের জমা জলে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে অবসর বিনোদন করছে। হেড মাস্টারমশাইয়ের নজরে পড়াতে, পিয়োন রামচন্দ্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, রাম, ওদের কি ছাতা নেই? বাড়ি যাবে না ওরা?

রামচন্দ্র জাতে পশ্চিমা হলেও দীর্ঘকাল বাংলা তল্লাটে থাকবার সুবাদে বাংলা ভালোই বলে। কেবল কতক শব্দের ক্ষেত্রে উচ্চারণের ত্রুটি হয়। আমি খবর করতেছি, সার। বলেই সে প্রায় দৌড় দিল। করণিক গোপীনাথ দত্ত বললেন,

খেলায় মজা পাইছে কিনা, তাই ঘরে ফেরনের তাড়া নাই। বাড়ি গ্যালেই বাপ-মায়ের শাসন।

রামচন্দ্র ফিরে এসে জানাল, ছোকরাদের স্যার ছত্রি নাই।

এ তো সমস্যার কথা হল! চিন্তা ব্যক্ত করলেন হেডমাস্টারমশাই।

স্বর্ণকমলবাবু বললেন, ত্যামুন অইলে না-হয় আমাগোর ছাতা দিয়া অগো পাঠায়া দ্যাওয়া যাক। রাম সঙ্গে গিয়া ছাতাগুলান ফিরত আনব। কথাগুলো বলেই প্রায় স্বগতোক্তি করলেন তিনি, অ্যাগো বাপ-মায়েরও কুনো চিন্তা নাই।

গোলোকনাথ মৈত্র ইতিমধ্যে পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তৈরি হতে শুরু করেছেন। কেন-না কোনো এক অজ্ঞাত বার্তা ইতিমধ্যে তাঁর মনের ভেতরে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। তিনি তাঁর বিদ্যাসাগরি চটিজোড়া হাতে তুলে নিতেই হেডমাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন, মৈত্র মশায়ও কি এগুচ্ছেন?

আজ্ঞে। হঠাৎ করে একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল কিনা, তাই। উত্তর করলেন গোলোকনাথ।

প্রায় অর্ধেক স্নান করে কোনোক্রমে চামড়ার চটিজোড়াকে জল থেকে বাঁচিয়ে ঘরের বারান্দায় পদার্পণ করতেই স্ত্রী কামদাদেবী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। যা ভাবছিলাম। রোসো, রোসো। গামছা আনি আগে। ত্বরিতে ঘরের মধ্যে ফিরে গেলেন তিনি। শুকনো গামছা নিয়ে স্বামীর হাতে দিয়ে বললেন, আগে মাথাটা মোছো। ন্যালে সর্দিজ্বর হবেনে। তারপরে গা-হাত-পা মুছে, পরনের কাপড়খান এখানেই চ্যারে থোও। গামছা জড়ায়ে, ঘরে যায়ে, শুকনা ধুতি পরো গা।

স্ত্রী-কে সমীহ করেন গোলোকনাথ। বললেন, যা বৃষ্টি নামছে, তাতে খুব শিগগির থামবে বলে মনে হয় না। সকলেই এইভাবে বাড়ি ফিরল।

জগু আসচ্যে আজ দুফুরে।

ঘরে প্রবেশ করতে করতে গোলোকনাথ নিজের মনেই বললেন, তাহলে ধারণাটা অমূলক ছিল না। স্ত্রী-র কথা শুনে শয়নকক্ষের দিকে নজর ফিরিয়ে ছেলেকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সে?

কোঠাঘরে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে গপ্প করতেছে।

জ্যাঠামশায় আসচ্যেন নাকি? এ তো সোনায় সোহাগা! কখুন?